RAY: International Journal of Multidisciplinary Studies, E-ISSN: 2456-3064
Volume V, No. 1, April, 2020, pp. 74-89.

কবিতায় দেশভাগ: সমাজ-ঐতিহাসিক প্রেক্ষণ

Tarak Nath Chattapadhyay
Assistant Professor,
Department of Bengali,
Haringhata Mahavidyalaya,
Nadia, West Bengal, India.
tarakcnath@gmail.com

কথাবস্তুর কাঠামো (Structure Abstract):

দেশভাগের কবিতায় সমাজ-সমকাল কেমনভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, উদ্বাস্তু সমস্যায় মানুষ কেমন দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে, জন্মভূমি-প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের বিচ্ছেদ বেদনায় মানুষ কেমন ভাবে মর্মযন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, আমরণ সেই দুঃখময় স্মৃতি কেমনভাবে বয়ে বেড়িয়েছে তারই সুলুকসন্ধান করা হবে দেশভাগ সম্পর্কিত কবিতাগুলির বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে। তৎসহ কবিতায় দেশভাগের প্রসঙ্গ বহুমাত্রিক প্রেক্ষিতে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করার প্রয়াস এই গবেষণামূলক প্রবন্ধে লক্ষ্য করা যাবে।

উদ্দেশ্য (Purpose) / পদ্ধতি / প্রকরণ (Methodology): দেশভাগের কবিতাগুলির মধ্যে সমাজ ও সমকালের মানব মনের এক সংকটাপন্ন ছবি ফুটে উঠেছে। কবিতার ভাষা ও কথাকে আশ্রয় করে দেশবাসীর চিন্তন, মনন ও অনুভূতির স্বরূপ উদ্ঘাটনই আলোচ্য প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য।

উপপদ (Findings): দেশভাগের ফলে মানুষের মধ্যে যে অস্থিরতা, চঞ্চলতা, হতাশা ও নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রতিফলন কাব্য-কবিতায় কিভাবে বাণীরূপ লাভ করেছে সেই রূপরেখা আলোচনায় লক্ষ্য করা যাবে।

সীমাবদ্ধতা (Limitations): দেশভাগের বিষয় নিয়ে রচিত কবিতার সংখ্যা অসংখ্য। তন্মধ্যে বিশেষ কয়েকটি কবিতার তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ উদ্ঘাটন করা হয়েছে।

সূচকশব্দ (Keywords): দেশভাগ, দ্বিধাবিভক্ত, স্মৃতি, সমব্যথী, অনুভূতিপ্রবণ।

Type of Paper: বিশ্লেষণমূলক (Analytical) ।

মূল প্রবন্ধ

কবিতার অন্তর্লোকে কবিমনের শিকড় প্রসারিত থাকে। সমাজের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় কবিমনকে প্রভাবিত করে। সমাজ, দেশ ও কালের ঘটনা কবির কবিতায় মূর্ত হয়ে ওঠে। দেশভাগ এমনই এক অনুভূতিপ্রবণ বিষয় যা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দেশ, রাষ্ট্র তথা জাগতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রেই অস্থির বেদনার বাতাবরণ তৈরী করে। সময়ান্তরে তা থেকে সাময়িক দূরে থাকা যায় কিন্তু দেশভাগের বেদনা, অস্থিরতা ও মানসিক যন্ত্রণা থেকে কোন দিনই মুক্তি পাওয়া যায় না। দেশ মানে শুধু মানচিত্রে আঁকি-বুকি নয়, দেশ হল হৃদয়ের শিরা-উপশিরা দিয়ে বয়ে যাওয়া রক্ত-স্রোতের এক জীবন্ত ধারা; দেশ মানে শুধু নদ-নদী, মাটি, জল নয়, দেশ মানে দেশবাসীর প্রাণের টান, হৃদয়ের আকুতি ও জীবনের আহূতি। দেশ মানে চোখের জল, বুকের রক্ত, মনের স্বপ্ন, পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য, শিকড়ের অস্তিত্ব ও ভবিষ্যতের আশা। দেশের জন্য পুরুষ দিয়েছে তার শেষ রক্তবিন্দু, নারী দিয়েছে ত্যাগ। নারী স্বামীত্বের অহঙ্কারে অহঙ্কারী না হয়ে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তি পাওয়াকে শ্রেয় মনে করেছে। দেশের জন্য হাজার হাজার সন্তানেরা চিরকালের মত বাবা শব্দ উচ্চারণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। হাজার হাজার মাতা সন্তান হারানোর বেদনায় চোখের জল বুকে চেপে রেখে স্বাধীন ভারতের সূর্যোদয়ের অপেক্ষায় দিন গুনেছে। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে সুখানুভূতির ঢেউ স্তিমিত হবার পূর্বেই দেশভাগের খবরে মানুষের মন ও হৃদয় ভেঙে চুরমার হেয় গেল। সূক্ষ্ম অনুভূতির স্নায়ুতন্ত্রে যে বেদনার ঢেউ প্রবাহিত হল তাতে মানুষ ভাষাহীন হয়ে গেল। দেশ ভাগের চর্চা আলোচনার বাতাস গুমরে গুমরে কেঁদে ঝরাপাতার ন্যায় মাটিতে লুণ্ঠিত হল। দীর্ঘশ্বাস দীর্ঘায়িত হয়ে বুকের সঙ্গোপনে যন্ত্রণা নামক ক্ষতের সৃষ্টি করল। কবি-সাহিত্যিকরা লেখনীর মাধ্যমে সেই ক্ষতকে প্রকাশ করলেন সাদা কাগজের উপর। দেশভাগের অসীম বেদনা বহনের ক্ষমতা সাদা কাগজের আর কতই বা থাকে? তাই লক্ষলক্ষ মানুষ অন্তরের হাহাকার ও অব্যক্ত বেদনা আমরণকাল পর্যন্ত

হৃদয়ে ধারণ করেছে। স্বাধীনোত্তর যুগে রঙ্গলাল পরাধীন মানুষের মনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এই ভাবে---

"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,

কে বাঁচিতে চায়?

দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,

কে পরিবে পায়।

কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে

নরকের প্রায়।

দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গসুখ তায় হে

স্বর্গসুখ তায়।"[১]

স্বাধীনতাহীন জীবন থেকে মৃত্যুই শ্রেয়, পরাধীন জীবন শৃঙ্খলময়, পরাধীন থাকা দাসত্বের ন্যায় নরকযন্ত্রণাময়; অন্যদিকে দিনেকের স্বাধীনতা হল স্বর্গের ন্যায় সুখ – এইরূপ ভাবনা শুধু কবির নয়, সমগ্র ভারতবাসীর। কিন্তু বাস্তবে 'দিনেকের স্বাধীনতা'য় যখন দেশভাগের শিলমোহর পড়ল তখন সমস্ত সুখ-নিদ্রা চিরতরে দূর হয়ে গেল। লক্ষলক্ষ মানুষের সেই ব্যথাহত হৃদয়ের কথাকেই কবি ভাষাতে প্রকাশ করে লিখলেন---

"সে কোন দেশ, যার বিরহে এই কষ্ট। আমি কি ছিলাম

সেখানে কোনোদিন, না কি এখনো দেখিনি, না কি আমি

সেখানেই আছি?

আমার চোখ থেকে ফলের মতো ঝুলছে? সে কি স্মৃতি

আমার গা বেয়ে গাছের মতো বর্ধিষ্ণু-- সে কি আশা?

একদিন আমি আমার হৃদপিণ্ড উপড়ে পাখিদের

খাইয়েছিলাম, ঝাঁক বেঁধে সেই দেশের দিকে তারা উড়ে গেলো।''[২]

স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা পরাধীন যুগে এবং স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই দেশভাগের যন্ত্রণা এভাবেই মূর্ত হতে দেখি কাব্য-কবিতায়। নস্টালজিক চেতনায় আচ্ছন্ন কবি স্মৃতি রোমন্থন করে দেশ হারানোর বিরহে কাতর হয়ে পড়েছেন। কোনদিন সেখানে ছিলেন কিনা মনে সন্দেহ জাগছে এবং হৃদপিন্ড উপড়ানোর যন্ত্রণা অনুভব করছেন।

একতা, সাম্য ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করে গেছেন সম্রাট অশোক থেকে চৈতন্যদেব। স্বামী বিবেকানন্দও যে ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখিয়েছেন তার মূলেও আছে মানুষের একতা ও সার্বিক উন্নয়ন। ব্রিটিশ আমলে স্বদেশী চিন্তা ও স্বাজাত্যবোধমূলক এমন কিছু কবিতা রচিত হয়েছে যেগুলি মন্ত্র, স্তোত্র বা আজানের থেকেও পবিত্র, কারণ সেগুলিতে মানুষকে প্রাণিত করেছে স্বাধীনতার পথকে ত্বরান্বিত করার জন্য। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এই 'ধনধান্য পুষ্প ভরা' প্রকৃতির রূপবন্দনা করতে গিয়ে যে স্বদেশী চেতনার প্রকাশ ঘটালেন তাতে দেশ ও দশের ভাবনাই যেন বাণীমূর্তি লাভ করেছে। জন্মভূমিকে 'রাণি' সম্বোধন করে লিখেছেন---

''এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি

সকল দেশের রাণি সে যে আমার জন্মভূমি...''

'জন্মভূমি'র স্থান সবার উপরে, এমনকি মানব-কল্পিত স্বর্গের থেকেও তার স্থান উচ্চে, ঋষি বাল্মীকি তা উল্লেখ করে গেছেন – 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী।'

দেশভাগের ফলে মানুষের ভাবাবেগে আঘাত লাগে। যুগ যুগ ধরে যে একতার মন্ত্রে মানুষ দীক্ষিত ছিল সেই ভাবনায় চিড় ধরে। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকার ইতিহাস খণ্ডিত হয়। আবার নতুন করে সঙ্কল্প নিয়ে বলতে হয়---

"বল-বল-বল সবে, শত বীণা-বেণু রবে

ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে..."

"স্বদেশপ্রেমের এই বিচিত্র আবেগ পাশ্চাত্ত্য চিন্তাচেতনার সঙ্গে পরিচয়ের ফলে উনিশ শতকের বাংলা কাব্যেও বঙ্গভূমি তথা ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয়েছিল। যদিও ঔপনিবেশিক ভারতে তার রূপ ছিল কিছু স্বতন্ত্র। স্বদেশপ্রেম বিষয়ক বাংলা কবিতায় মূল কয়েকটি যে প্রবণতা দেখা যায়, সেগুলি হল:

১. বঙ্গভূমি তথা ভারতভূমির চিন্ময়ী মাতৃরূপে বন্দনা,

২. দেশের অতীতের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের বিপ্রতীপে বর্তমান শ্রীহীন দশায় কবির অন্তরবেদনার প্রকাশ – কখনো বা এই বেদনার প্রকাশ ব্যঙ্গবিচ্ছেদের তীর্যক পথে,

৩. পরাধীনতা থেকে মুক্তিলাভের আকুলতা,

৪. দেশসেবায় জীবনোৎসর্গের প্রেরণাদান,

৫. মাতৃভাষা বন্দনা।"[৩]

দেশের সঙ্গে দেশবাসীর নাড়ীর যোগ, প্রাণের টান থাকে, থাকে প্রশ্বাসের সঙ্গে মাটির ঘ্রাণ। পৈতৃক ভিটেমাটি তথা জন্মভূমিকে ছেড়ে দেশভাগের সময় মানুষকে পাড়ি দিতে হয়েছে অন্যদেশে। বস্তুগত উপাদান উপকরণকে যথাসম্ভব সঙ্গে নিয়ে, জমিবাড়ির মায়া ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে অগণিত পরিবারকে, কিন্তু মন, মমতা, হৃদয়, আত্মা, অনুভূতি, স্মৃতি ইত্যাদি সবই

ফেলে যেতে হয়েছে মনের অগোচরে। মণীন্দ্র রায়ের 'চিঠি' কবিতায় দেশত্যাগের মর্মবেদনার চূড়ান্ত প্রকাশ দেখা যায় সরলার মা নামে এক মহিলার মধ্য দিয়ে। সরলা ও তার বাবা অনেক আগেই গত হয়েছেন। একদিন অবিভক্ত পাকিস্তানের পাবনায় তাদের বাড়ি ছিল। তারপর তিনি উদবাস্তু রমণী, তিনকুলে তার কেউ নেই। কবির বাড়িতেই ঝি-গিরি করে তার দিন কাটে। পূর্ববঙ্গের পাবনায় বন্যার খবর শুনে বারান্দায় বসে কাঁদতে শুরু করে। কবি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে বলেন, যা গেছে তা নিয়ে ভেবে লাভ নেই। তাছাড়া এদেশেও তো বন্যা হয়েছে, কত লোক মারা গেছে। কিন্তু সরলার মা'র মনে নিজ গ্রামের যে স্মৃতি মনের মন্দিরে জমে আছে, তাকে তিনি ছেড়ে এলেও ভুলতে পারেননি। অনুভূতিপ্রবণ কবি সরলার মা'র অন্তরে ডুব দিয়ে যে সত্য উদ্ঘাটন করেছেন তাকেই কবিতার আকারে তুলে ধরেছেন। সরলার মা বলেছে,

> "কাঁদনের কপাল কী কব! / সোয়ামি মরেছে কোন কালে,
>
> এক মেয়ে সেও গেল শেষে / ভিটামাটি ছেড়ে একা আমি
>
> বেঁচে আছি এ পোড়াকপালে / তোমাদের দুয়ারে বিদেশে!
>
> ... কিন্তু সেই বাড়ি / এতটুকু হতে যারে চিনি
>
> আর সেই ঘর পুবদুয়ারি / সিদুঁরে আমের চারা"[৪]

স্বামী-সন্তানের অকালে চলে যাওয়ার কথা স্মরণ করে কাঁদেনি, বরং ভিটেমাটি ছেড়ে চলে আসার জন্য অদৃষ্টকে দোষ দিয়ে নিজেকে সে পোড়াকপালী বলেছে। ছোটবেলা থেকে চেনা বাড়ির পুবদুয়ারি ঘর, সিঁদুরে আমের চারা সহ ভিটেমাটি নগদ অর্থে বিক্রী করে আসলেও মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। শুধু ভিটেমাটিই নয়, প্রতিবেশী রহিমের বাবা, রসুল, করিমের বেটা, আমিনা ও বুড়ো বট গাছের কথা সে ভুলতে পারেনি। 'টাকা-আনা-পাইয়ে'-র হিসেব সে

করেনি; ভিটেমাটি, মানুষ, প্রকৃতি --- সবের মধ্যেই সরলার মা নিজস্বতা খুঁজে পেত। দেশভাগের কাঁটাতার মন ও হৃদয়ের মাঝে কোনো সীমারেখা টানতে পারে না। যে বিশ্বাসে পাখি বাসা বাঁধে, গাছে ফুল ফোটে, ফল ধরে, মা শিশুকে বুকে তোলে সেই অটল বিশ্বাস নিয়ে সরলার মা স্বদেশকে ভালোবেসেছিল। শিরায় শিরায় ওতপ্রোতভাবে নিজ দেশ সম্পর্কে যে ভাবনা, অনুভূতি ও মায়া লুকিয়ে থাকে তাকে আমরা দেশাত্মবোধ বলতে পারি, কিন্তু নিরক্ষর সরলার মা'র হৃদয়ে নিজ দেশের প্রতি যে শ্রদ্ধা বিজড়িত মমতা স্মৃতি হয়ে জমে আছে তা হল উদ্বাস্তু রমণীর হৃদয় নিঙড়ানো আর্তনাদ। এই বেদনা শুধু তার একার, আর যারা দেশভাগের শিকার তাদের। অতিসাধারণ নারীর হৃদয়ে দেশভাগের স্মৃতি কেমনভাবে আছে মণীন্দ্র রায় তা সযতনে তুলে ধরেছেন। সরলার মা'র হৃদয়-বেদনাকে কবি হৃদয় দিয়ে অনুভব করে বলেছেন,

> "বুঝি সে তো খোঁজে না স্বদেশ / টাকা-আনা-পাইয়ের হিসাবে,
>
> ঘর-বাড়ি-মানুষ-প্রকৃতি / বিন্দুবিন্দু মিলে যে উন্মেষ
>
> সে দীপ্ত আলোতে তার স্মৃতি / আশ্বিনের প্রখর আকাশ!"[৫]

জন্মভূমিকে সকলেই ভালোবাসে কিন্তু এরূপ ভালোবাসতে পারে ক'জন? মাছকে জল থেকে তুলে তাকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করলে সে যেমন মারা যায়, সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর মাতৃবিয়োগ ঘটে সেই নবজাত শিশুর যেমন অবস্থা হয়, তেমনি জন্মভূমি থেকে রাজনৈতিক সীমারেখা টেনে মানুষকে যদি অন্যত্র বসতি স্থাপন করতে হয় তখন সেই মানুষের অবস্থাও হয় মৃত্যুসম --- সরলার মায়ের মত। স্বদেশ ও স্বজন হারানোর বেদনা নিয়ে বেঁচে থাকা যে কত যন্ত্রণাময় তা সরলার মা'র মধ্য দিয়ে কবি তুলে ধরেছেন।

বুদ্ধদেব বসু 'উদ্বাস্তু' কবিতায় দীর্ঘ বর্ণনামূলক ব্যাখ্যানে এক রমণীর কথা প্রচ্ছন্নভাবে তুলে ধরেছেন। ভোরবেলায় শরীর চর্চা করা মানুষের কৌতূহলী ইচ্ছায় সেই রমণীর ভাবলেশহীন

কথয় এক বিস্মৃতির অধ্যায় ধরা পড়েছে। ফুটপাতের উপর জন্তুর মত গুছিয়ে সে শুয়ে আছে। জন্তুর সঙ্গে পার্থক্য শুধু গায়ে চট ও কাঁথা জড়িয়ে শুয়ে থাকাতে। তাকে দেখে পথচলতি মানুষের প্রশ্ন,

"এ কোত্থেকে এলো? যাবার সময় তো দেখিনি এখানে।

পুব-বাংলার উদ্বাস্তু বলেও মনে হয় না,

কথা বলছে চব্বিশ পরগণার।"[৬]

গ্রাম ছেড়ে, দেশ ছেড়ে, ভাষা ছেড়ে এরকম অনেক মানুষ পরিচয়হীন হয়ে পড়েছিল। দেশভাগের দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করা যায় না, কাউকে বলে হাল্কাও হাওয়া যায় না, একটা সময়ের পরে চোখ ফেটে জলও আর বের হয় না এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণাও চলে যায়। হৃদরোগীদের যেমন বাইরে থেকে দেখে মনে হয় সব ঠিক আছে কিন্তু বুকের মধ্যে মারণ ব্যধি খেলা করে, তেমনি নিজ ভূমি হতে বিতাড়িত মানুষকে দেখে তার মনের জ্বালা বোঝা যায় না অথচ বোবা দুঃখ তার বুকের উপর ঘুন পোকার মত তাকে কুরে কুরে ফোঁপরা করে দেয়। তাদের কথা চর্চা-আলোচনা হতে হতে আজ বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। ধরা আছে শুধু কবি-সাহিত্যিকের কলমের আঁচড়ে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'ধাত্রী' কবিতায় আর এক উদ্বাস্তু বুড়ির কাহিনি তুলে ধরেছেন --- সে যেন প্রতিনিধিত্ব করছে অসংখ্য ধাত্রী মাতার। ভিখারিনী রূপী বুড়িমাকে দেখে অনেকের মনেই পুরোনো স্মৃতি জেগে উঠবে --- যারা হয়তো একদিন এরকম রিফিউজি ধাত্রী বুড়ির বদান্যতায়, স্পর্শে ও আদরে পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধের স্বাদ পেয়েছে। সে যেন অতীত ইতিহাসের স্বাক্ষী হয়ে বসে আছে---

"শিয়ালদার ফুটপাতে বসে আছেন আমার ধাইমা

দুটো হাত সামনে পেতে রাখা,

ঠোঁট নড়ে উঠছে মাঝে মাঝে

যে কেউ ভাববে দিনকানা এক হেঁজিপেজি বাহাত্তুরে বুড়ি।

... ধাইমা, এ কোন পৃথিবী আমাকে দেখালে?

বুড়ি সর্বনাশিনী, আমাকে কেন বাঁচিয়ে রেখেছিলি

এই অকল্পনীয় দুনিয়ায়

আমি আর কত কিছু হারাবো?''[৭]

হারানোর হাহাকার বুকে চেপে রেখে পাবার আশায় বুক বেঁধে মানুষ স্বপ্ন দেখে ভবিষ্যৎ জীবনের। স্বজন হারানোর যন্ত্রণা মানুষ সয়ে নেয়, জীবনের সর্বসত্য অনুভব করে --- ভাবে একদিন তো মরতে হবেই কিন্তু দেশ হারানো, বাস্তু ভিটে হারানো, প্রতিবেশীদের হারানোর বিষয় মানুষের কাছে ছিল কল্পনাতীত। বজ্রপাতের ফলে কঠিন তালগাছ যেমন শুকোতে থাকে এবং ক্রমেই শিকড় দুর্বল হতে থাকে তেমনি দেশভাগের খবর দেশবাসীর কাছে ছিল বজ্রপাতের ন্যায় মারাত্মক আঘাত, যা তাদেরকে সমূলে উৎপাটিত করল। আশা-স্বপ্ন-ভালোবাসার মূলে নির্মম কুঠারাঘাত --- এই মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি জীবদ্দশাতে ঘুচবে না।

স্বাধীনতা পূর্ব ভারতের ইতিহাস ছিল সংগ্রাম, সংকল্প, ত্যাগ ও মাতৃবন্দনার আবেগ-উত্তেজনায় ভরপুর। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের লক্ষ্য ছিল একটিই --- স্বাধীনতা। পরাধীনতার গ্লানি বুকে থাকলেও একতার মন্ত্র ছিল আকাশে-বাতাসে। কিন্তু অধীনতার অবসান হবার পর চিত্র বদলে গেল, ভূগোল পাল্টে গেল, ঘটতে থাকল ভাগাভাগির খেলা। রচিত হতে লাগল ভাগাভাগির ইতিহাস। কবিতার ভাষা, গানের সুর ও মনের আবেগ পরিবর্তিত হতে লাগল।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় দেশ ও দশের এরূপ চিন্তা-চেতনার কথা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে বললেন---

"যতদিন ছিলে তুমি পরাধীনা ততদিন তুমি সবার জননী

এখন তোমাকে আর মা বলে ডাকে না কেউ

লেখে না তোমার নামে কবিতা

বুক মোচড়ানো সুরে সেই সব গান

কেউ কারো ভাই নয়, রক্তের আত্মীয় নয়

নদীর এপার দিয়ে, নদীর ওপার দিয়ে চলে যায় বিষন্ন মানুষ!"[৮]

কবিতার সাথে কল্পনার অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক কিন্তু এই বর্ণনা কাল্পনিক নয়, চরম বাস্তব সত্য। পরাধীন ভারতভূমি ছিল সবার, স্বাধীন ভারতভূমি হল ভাগের মা। তাই মাতৃভক্তি কমে গেল, 'বুক মোচড়ানো' গানের সুর হৃদয়ে উন্মাদনা জাগালো না, গুপ্ত কুঠুরিতে দেশাত্মবোধ আবেগের স্ফূরণে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হল না। এতদিন যারা প্রতিবেশী হয়েও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, সেই বন্ধন শিথিল হল। রক্তের সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও যারা এতদিন একে অপরের দুঃখে কেঁদেছিল, বিপদে ঝাঁপিয়েছিল, দুঃখ ও অনুভূতি এক হওয়ায় রক্ত দান করেছিল, দেশভাগের ফলে তারা উপলব্ধি করল প্রতিবেশীরা শুধুমাত্র বন্ধু 'রক্তের আত্মীয় নয়'। তাই তাদের ছেড়ে প্রতিবেশীরা অন্যত্র পাড়ি দিল। নদীর এপার-ওপারে যারা বাস করত তাদের মাঝে ছিল জল, তাই সম্পর্কও ছিল জলের মত স্বচ্ছ; দেশভাগের ফলে জলের মত স্বচ্ছ সম্পর্ক মুহূর্তেই সকলে জ্বলাঞ্জলি দিল। নদীর দুই তীরবর্তী মানুষের সংযোগের মাধ্যম ছিল নৌকোর সঙ্গে মনের, দেশভাগের ফলে নদীর এপার-ওপারের দূরত্ব মনের মধ্যে অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার অভাব দেখা দিল, বিশ্বাসে চিড় ধরল, কারণ 'কেউ কারো ভাই নয়, রক্তের আত্মীয় নয়'। তাই 'নদীর

এপার দিয়ে, নদীর ওপার দিয়ে চলে যায় বিষন্ন মানুষ' নিশ্চয়তার অন্বেষণে অনিশ্চিত জাতিগত আত্মীয়তার অনুসন্ধানে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতির সরণী বেয়ে কবিতার ভাষাকে সঙ্গী করে দেশভাগের বেদনাকে প্রকাশ করেছেন 'সাঁকোটা দুলছে' কবিতার মধ্য দিয়ে। বন্ধুত্বের আশা-নিরাশা-ভালোবাসার সুখ-দুখের ছবি কবিতার ভেলায় ভেসে গেছে। দশটি স্তবকের চল্লিশটি চরণের প্রতিটি ভাঁজে রয়েছে বন্ধুত্বের স্মৃতি। আনোয়ার নামে কবির এক বন্ধু ছিল --- যে আজানের সুরে জাগত, যার সঙ্গে বন্ধুত্ব-ঝগড়া, আড়ি-ভাব-খুনশুটি সবসময় চলত। তাকে হারিয়ে কবি দিশেহারা, কারণ 'বন্ধু হারালে দুনিয়াটা খাঁ খাঁ করে'। মাটির ঘর, সুপুরি গাছের সারি, পাশেই ধনুকের মত বাঁকা পড়শি নদী, হেলানো বট গাছ --- এসবের উপর মৃদু জ্যোৎস্নার মায়াবী আলোয় গ্রামখানি জমে উঠত। এই গ্রাম ও গ্রামের বন্ধু --- দুটিই তাঁর কাছে অতীত স্মৃতি। শৈশব-কৈশোরের বন্ধুর সঙ্গে কাটানো সময় আজ অতীত---

''খেলায় খেলায় জীবন পৃষ্ঠা ওড়ে

খেলায় খেলায় ইতিহাস দেয় উঁকি'[৯]

সবই ইতিহাস হয়ে গেছে। 'এপার' 'ওপার' শব্দ দুটি বারংবার ব্যবহার করে দেশভাগের বেদনার কথা তুলে ধরেছেন---

ক) 'এপারে ওপারে ঢিল ছুঁড়ে ডাকাডাকি'

খ) 'ভোরের কুসুম ওপারে ফুটেছে আগে / এপারে শিশির পতনের নীরবতা'।

গ) 'এদিকে ওদিকে পৃথিবীর পিঠ পোড়ে'

ঘ) 'এপার ওপার স্মৃতিময় একাকার'

নদীর ওপারের বন্ধুকে ঢিল ছুঁড়ে ডাকার সম্পর্ক যেখানে ছিল, আজ তা অতীত --- 'ঢিল' ঢেলাতে পরিণত দেশভাগের কারণে। যে সম্পর্কে কান পাতলে ওপারের লোকেরা এপারে ভোরবেলার 'শিশির পতনের নীরবতা' উপলব্ধি করতে পারত, বিভাজনের ফলে সেই উপলব্ধি স্বপ্নাতীত হয়ে গেছে।

স্বাধীনতা পূর্ব যুগে আমাদের সকলের আশা ছিল এক --- স্বাধীনতা অর্জন; স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আমাদের সকলের বেদনা হল এক --- দেশভাগ। স্বাধীনতার জন্য আমরা মুক্ত কণ্ঠে সমবেত ভাবে স্বদেশকে 'মা' বলে সম্বোধন করেছি। হাতে হাত রেখে লড়াইয়ের জন্য শপথ গ্রহণ করেছি, পুরুষানুক্রমে রক্ত ঝরিয়ে স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করেছি। জন্মভূমিকে অভয় প্রদান করে বলেছি---

"হে জননী,

আমরা ভয় পাইনি।

যারা তোমার মাটিতে নিষ্ঠুর থাবা বাড়িয়েছে

আমরা তাদের ঘাড় ধরে

সীমান্ত পার কের দেব।"[১০]

স্বাধীনতা বুভুক্ষ মানুষ স্বপ্ন দেখেছিল যুগযুগান্তর ধরে লড়াই-বলিদান, রক্ত-অশ্রুর মধ্য দিয়ে যখন নিজভূমে স্বরাজ আসবে তখন নিশ্চিন্ত মনে শান্তির নীড় নির্মিত হবে। নিজভূমে নিজেদের জীবনকে নিশ্চিন্তে কাটানোর পরিকল্পনা মানুষ শুরু করেছিল স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাক্ মুহূর্তে। আশায়-ভালোবাসায়-উত্তেজনায়-স্বপ্নিল অনুভূতিতে মনের মধ্যে স্বর্গ-সুখ রচনা করেছিল মানুষ। স্বাধীনতা এল কিন্তু সুখ-শান্তি এল না। নিজেই নিজেকে বোঝাতে থাকল যে, দেশ ভাগ হলেও আত্মিক সম্পর্ক ও ভাষাকে তো ভাগ করা যাবে না। কাঁটাতারের বেড়া রাজনৈতিক সীমারেখা,

মনোভূমির সীমা রেখা নয়। অস্বস্তির মধ্যে স্বস্তির সন্ধান ও নিরাশার মধ্যে আশার অনুসন্ধান করে সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখলেন---

"আমরা যেন বাংলাদেশের / চোখের দুটি তারা।

মাঝখানে নাক উঁচিয়ে আছে--- / থাকুকগে পাহারা।

দুয়ারে খিল। / টান দিয়ে তাই / খুলে দিলাম জানলা।

ওপারে যে বাংলাদেশ / এপারেও সেই বাংলা।।"[১১]

'যেন', 'থাকুকগে', 'তাই' ইত্যাদি শব্দে কবি সান্ত্বনা খুঁজে পেতে চাইছেন। দেশভাগের প্রতিফলন মানুষের চিন্তনে-মননে যখন পাকাপাকি স্থান গ্রহণ করেছে তখন তার থেকে উত্তরণের প্রয়াস এখানে প্রতিফলিত হয়েছে। দুয়ারে খিল দিয়ে মানুষ নিশ্চিত রাত্রি যাপন করলেও যেমন জানালা খুলে রাখে তেমিন ভারত বাংলাদেশের বুকে রাজনৈতিক সীমারেখা থাকলেও মনের জানালা খুলে এপার-ওপারে থাকা বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষেরা নৈকট্যের সম্পর্ক উপলব্ধি করতে চায়।

স্বরাজ স্বাধীনতার জন্য দেশভাগ --- অবিভক্ত ভারতবর্ষের জন সাধারণের কাছে ছিল অপ্রত্যাশিত। দেশভাগের সংবাদ তাই প্রথমে মানুষের কাছে মনে হয়েছিল নেহাতই রটানো খবর ও গুজব অথবা নেতাদের ইচ্ছায়, স্বার্থে ও বড়লাটের কৌশলী পদক্ষেপে দেশভাগ। মানুষের মনে এখন প্রশ্ন আসে যে, এত সংগ্রাম ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে যে স্বাধীনতা আসছে তার মূল্য কোথায়? স্বাধীনতার জন্য যদি দেশভাগের প্রয়োজন হয় তাহলে এত রক্ত-অশ্রুর মূল্য কোথায়? মানুষ কাকে দায়ী করবে, দেশের নেতা, না বড়লাটকে? এরূপ ভাবনার প্রতিফলন দেখি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায়---

"খবরের কাগজ নাকি বাংলা ভাগ করতে চায়?

নেতারা নাকি ভাতের হাঁড়ি ভাগ করতে ইচ্ছুক,

বড়লাটের আজ্ঞায়?...

নেহেরুর নখের আঁচড়ে জিন্নার গরিব মুসলমানের প্রতি দরদে,

দাঙ্গা, কারফিউ, ব্যর্থ ও মিথ্যায়?

নেতাদের নেতারা বাংলা ভাগ করতে চায়!...

ঘর ভাগ হোক,

ভাগ হতে দেব না দেহটা, প্রাণটা!"[১২]

বাংলা ভাগের ঘটনাকে মানুষ ভাল চোখে নেয়িন। কি উদ্দেশ্যে, কিসের স্বার্থে এই বিভাজন তা নিয়ে সন্ধিগ্ধ ছিল ভারতবাসী। তবে জনমত ও রাষ্ট্রনেতাদের স্বার্থসন্ধানী বিভেদবুদ্ধিই যে এর পশ্চাতে রয়েছে তা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট ভাষণে দৃঢ়তার সাথে সে কথা তুলে ধরেছেন। স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন দেশভাগ হলে ঘর ভাগ হবে এবং বসতি অন্যত্র গড়ে উঠবে কিন্তু মানুষের দেহ ও প্রাণ ভাগ করা যাবে না, এই টুকুই সান্ত্বনা।

নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে দীর্ঘদিন বাস করলেও দেশভাগের জ্বালা মানুষের মনে রয়েই যায়। স্মৃতি বড়ই বিষম বস্তু। সে অজান্তেই মনকে টেনে নিয়ে যায় চিন্তনের গভীরে। এরূপ অবস্থার কারণ অনুসন্ধান করে মানুষের মন খুঁজে বের করে অপরাধীদের। যাদের ওপর ভরসা-বিশ্বাস করে মানুষ শান্তি ও স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিল তারাই তাদের বিভ্রান্ত, ব্যথিত ও ভিটেছাড়া করেছে। সেই সমস্ত দেশ নেতৃত্বের প্রতি বক্রবাণ বর্ষিত হয়েছে---

"তেলের শিশি ভাঙল বলে

খুকুর পরে রাগ করো

তোমরা যে সব ধেড়ে খোকা

বাঙলা ভেঙে ভাগ করো।

তার বেলা?''[১৩]

ব্যক্তি আলাপচারিতায়, সৌজন্য সাক্ষাৎকারেও প্রাসঙ্গিকভাবে সুখ-স্মৃতির পথ ধরে শিকড়ের সন্ধান করা হয়। বন্ধুত্ব স্থাপন, অপরিচিতের সঙ্গে পরিচিতির গুরুত্ব নির্ণয় এবং সর্বোপরি বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হবার পূর্বে বয়জৈষ্ঠ ব্যক্তিরা 'আদি বাড়ি বা দেশের বাড়ি'-র তথ্য জানতে চান। যদি তারা বা তাদের পূর্বপুরুষ একই জেলা বা স্থানের অধিবাসী হন তখন সাবলীলভাবে ব্যবহার-কথাবার্তা ও সম্বন্ধ এগোনোর ক্ষেত্রে পথ অনেকটা সুগম হয়ে যায়। পূর্ববঙ্গীয় পরিবারের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গীয় পরিবারের সখ্যতা জমে না এবং বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হবার ক্ষেত্রে অনেক সময় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। আজকের আধুনিক জীবনে উদারতা ও সম্প্রীতির বাণী প্রচারের ফলেও এই ভাবনার মূলোচ্ছেদ করা যায়নি। অথচ ভারত বিভাগ পূর্ববর্তী সময়ে এরূপ প্রসঙ্গের উত্থাপন হত না বা হলেও তাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত না।

স্বাধীনতার বাহাত্তর বৎসর অতিক্রান্ত হবার পরও একই ভাষাভাষী মানুষেরও মনে নানা প্রশ্ন ও ভেদ-বিভেদের আবরণ আজও বজায় আছে --- দেশ বিভাগ মানুষের চিন্তনে ও মননে এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছে। কবি-সাহিত্যিক সহ অন্যান্য বুদ্ধজীবীরা বলে গেছেন বা বলছেন যে, কাঁটাতারের বেড়া কখনও একই ভাষাভাষী মানুষের মনে সীমারেখা টানতে পারে না।

সহায়ক গ্রন্থ

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল, 'পদ্মিনী উপাখ্যান', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৯।

২. বসু, বুদ্ধদেব, বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা, অষ্টম সংস্করণ, ১৯৯০, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৯, পৃ: ১৪৩।

৩. সোম, সন্দীপকুমার, 'উনিশ শতকের বাংলা কাব্যে স্বদেশচেতনা', প্রবন্ধ, প্রবন্ধ সঞ্চয়ন, দ্বিতীয় খণ্ড, রত্নাবলী, কলকাতা-০৯, পৃ: ২৮।

৪. রায়, মণীন্দ্র, মণীন্দ্র রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৯।

৫. প্রাগুক্ত।

৬. বসু, বুদ্ধদেব, প্রাগুক্ত, পৃ: ১১৪।

৭. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ত্রয়োদশ সংস্করণ, ২০০২, দে'জ পাবিলিশিং, কলকাতা-০৯, পৃ: ১০৪।

৮. প্রাগুক্ত, পৃ: ২০৭।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ: ২২৭।

১০. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, সপ্তম সংস্করণ, ১৯১১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৯, পৃ: ৮৬।

১১. প্রাগুক্ত, পৃ: ৫০।

১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, মাণিক, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, সম্পাদনা যুগান্তর চক্রবর্তী, চতুর্থ মুদ্রণ, মে, ১৯৮৭, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ৭৩, পৃ: ৬৪।

১৩. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, সম্পাদনা, সাহিত্যম, কলকাতা-৭৩, পৃ: ৩৭।